প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, দ্বাদশ সংখ্যা, জুন ২০২২, আষাঢ় ১৪২৯

বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় পর্যালোচনা

দিলীপ কুমার বড়ুয়া*

শান্টু বড়ুয়া**

সারসংক্ষেপ

মূর্তি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মাচার পালন এবং সত্তার উপাসনা করা। এক একটি সত্তা আবার বিশেষ শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচ্য। সাধারণত সত্তাগুলো কল্যাণ, শাশ্বত মঙ্গল, প্রজ্ঞা, স্বর্গীয় সুষমা প্রভৃতি প্রকাশ করে। এ কারণে মূর্তিশাস্ত্রে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মকাহিনিতে যেভাবে সত্তার রূপ বর্ণিত আছে, ঠিক সেভাবে সত্তার মূর্তি নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। মূর্তিশাস্ত্রে প্রতিটি সত্তার জন্য চরিত্র অনুযায়ী কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা আছে। শিল্পীকে এসব বিবেচ্য বিষয় বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূর্তি নির্মাণ করতে হয়। এসব বৈশিষ্ট্যসত্তা সনাক্তকরণের পাশাপাশি মূর্তিশিল্পের স্বকীয়তা ও নান্দনিকতা প্রকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের পরিচিতি, অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উপস্থাপিত হয়েছে।

১. ভূমিকা

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে মূর্তি নির্মাণের বিভিন্ন বিধি-বিধান বা অনুশাসন বর্ণিত আছে। অনুশাসন মতে, ধর্মতত্ত্বে যেভাবে যে আরাধ্য-সত্তা বা দেব-দেবীর রূপ কল্পিত হয়েছে সেভাবেই সেই সত্তার মূর্তি নির্মাণ করতে বা মূর্তিতে রূপ প্রদান করতে হবে। এই অনুশাসনগুলো 'ধ্যান' নামে অভিহিত। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রত্যেক সত্তার নিজ নিজ ধ্যান নির্ধারিত আছে। শিল্পীগণ সেই ধ্যান অনুসরণ করেই মূর্তি নির্মাণ করেন। ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে:

* অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শারীরিক গঠনশৈলী, মুদ্রা, আসন, পীঠিকা, পাদবেদী, বাহন, শারীরিক ঠাম, জ্যোতিচক্র, আয়ুধ, অলংকার, পোশাক, মুকুট, কারুকাজ, সহচর, অনুচর প্রভৃতি। এছাড়াও দেবত্ব আরোপের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রতীকও ব্যবহৃত হয়। সত্তাদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে, কিছু কিছু দেবতার একাধিক রূপ এবং ধ্যান লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র হিসেবে খ্যাত সাধনমালা এবং নিষ্পন্নযোগাবলি গ্রন্থে ধ্যানের অন্তর্গত বিষয় এবং মূর্তি নির্মাণের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণিত আছে। এছাড়া চর্যাপদেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের সচিত্র[১] ধারণা প্রদান করা আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২. মুদ্রা

সাধারণত মুদ্রা শব্দের অর্থ হলো চিহ্ন, সংকেত, অঙ্গবিক্ষেপ বা অঙ্গভঙ্গি, সীলমোহর ইত্যাদি। হিন্দু এবং বৌদ্ধ শিল্পশাস্ত্র অনুসারে হাতের বাহু, পাতা এবং আঙ্গুলের বিন্যাসের মাধ্যমে এক প্রকার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করা হয়, যা মুদ্রা নামে অভিহিত। (Williams, 1899: 822) মুদ্রার ধারণা মূলত ভারতীয় উৎস হতে উদ্ভূত, যা ত্রিপিটক এবং ভারতীয় বিভিন্ন কথা কাহিনিতে নানাভাবে পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে বিভিন্ন রকম মুদ্রার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যেও মুদ্রার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জানা যায় যে, ভরতনৃত্যে ২০০-এর অধিক এবং তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে ১০৮-এর অধিক মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। হাত ও হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে এসব মুদ্রা প্রদর্শন করা হলেও কিছু কিছু মুদ্রায় সমগ্র শরীরও সংশ্লিষ্ট থাকে। (Shaw, 2006: 17; Devi, 1990: 43) বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রে মুদ্রাকে আধ্যাত্মিক অঙ্গভঙ্গি (spiritual gesture) হিসেবে গণ্য করা হয়। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র হিসেবে খ্যাত সাধনমালা ও নিষ্পন্নযোগাবলি গ্রন্থে এবং বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটি মুদ্রা একটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জনার প্রতিনিধিত্ব করে। এসব ভাবব্যঞ্জনার মধ্যে রয়েছে ক্ষমা, প্রার্থনাপূরণ, নির্ভয় বা নিশ্চয়তা, সুরক্ষা, শান্তি, দয়াশীলতা, যুক্তিখণ্ডন, প্রজ্ঞা, অতীন্দ্রিয়তা, তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা, আজ্ঞা, ইঙ্গিতের অনুজ্ঞা প্রভৃতি। (হোসেন, ২০০৬: ৩৩) ভাবব্যঞ্জনাভেদে মুদ্রার প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ, ভাবব্যঞ্জনাভেদে একেকটি মুদ্রা একেক রকম। নিম্নে বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে ব্যবহৃত কিছু মুদ্রার পরিচয় তুলে ধরা হলো:

২.১. অভয় মুদ্রা: বৌদ্ধধর্মে অভয়মুদ্রা সাধারণত নির্ভয়ের প্রতীক। কিন্তু এটি সুরক্ষা, শান্তি, দয়াশীলতা, নিশ্চয়তা এবং নিরুদ্বিগ্নতা প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জনাও প্রকাশ করে। (Buswell, 2013: 2; হোসেন, ২০০৬: ৩৩; ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪১) এই মুদ্রা ধারণ শাক্যমুনি বুদ্ধ এবং ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির বৈশিষ্ট্য। দাঁড়ানো অবস্থায় সাধারণত ডান হাত কনুই-এর স্থানে ভাঁজ করে কাঁধ পর্যন্ত উত্থিতপূর্বক হাতের আঙ্গুলগুলি যুথবদ্ধ অবস্থায় উপরের দিকে সোজা রেখে তালু বহির্মুখ বা ভক্তের দিকে প্রদর্শন এবং বাম হাত নীচ দিকে প্রসারিত করে রাখা হয় এই মুদ্রায়। অপরদিকে, বসা অবস্থায় ডান হাত দাঁড়ানো অবস্থার মতো একই ভাবে রেখে এবং বাম হাতের আঙ্গুল যুথবদ্ধ অবস্থায় ও তালু উপরের দিকে রেখে কোলে স্থাপন করে রাখা হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নভাবেও এই মুদ্রা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। যেমন, কোনো কোনো মূর্তিতে উভয় হাতে, কোনো কোনো মূর্তিতে বাম হাতে অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। আবার, কোনো কোনো মূর্তিতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা তর্জনী স্পর্শ করে এবং অপর আঙ্গুলগুলি যুথবদ্ধ অবস্থায় সোজা রেখে এই মুদ্রা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধ এই মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক মত্তহস্তি নালগিরিকে দমন করেছিলেন। উক্ত কাহিনি বিভিন্ন ফ্রেস্কো, চিত্রকলা এবং গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের পূর্বে এই মুদ্রাটি অপরিচিত জনকে বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশের মঙ্গলময় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। নিচে বিভিন্ন রকমের সচিত্র অভয়মুদ্রা দেখানো হলো:

২.২. ভূমিস্পর্শ মুদ্রা: এই মুদ্রাটি অন্তর্মুখী প্রজ্ঞালাভের ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। এছাড়া, এই মুদ্রা দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় এবং দৃঢ়-সংকল্পও নির্দেশ করে। এই মুদ্রায়

পদ্মাসনে বসা অবস্থায় ডান হাতটি ডান হাঁটুকে স্পর্শ করে আঙ্গুল দিয়ে ভূমিতে স্থাপিত পদ্মাসন স্পর্শ করে। তবে হাতের তালু অন্তর্মুখীভাবে রাখা হয়। অপরদিক, বাম হাতের তালু ঊর্ধ্বমুখী করে কোলে স্থাপন করে রাখা হয়। বুদ্ধের বোধিজ্ঞান তথা বুদ্ধত্ব লাভের মুহূর্ত বা ঘটনা এই মুদ্রায় প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। জানা যায়, সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিজ্ঞান লাভপূর্বক বুদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করলে মার[২] তাতে সংশয় প্রকাশ করে এবং বুদ্ধকে এমন একজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলেন, যিনি তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। তখন বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে বসে ভূমি স্পর্শ করে ধরিত্রীকে সাক্ষী করেন। অতঃপর, ধরিত্রী বুদ্ধত্ব লাভের বিষয়ে সাক্ষ্য দান করলে মার পলায়ন করে। মারকে পরাজয়পূর্বক বুদ্ধ ধরিত্রীকে সাক্ষী রেখে দৃঢ় মনঃশক্তির যে স্ফুরণ ঘটিয়েছেন এই মুদ্রায় তারই প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। (Vessantara, 1993: 74-76; Shaw, 2006: 17; হোসেন, ২০০৬: ৩৩; ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪৩) এই কারণে এই মুদ্রাকে মার বিজয় মুদ্রাও বলা হয়। এই মুদ্রা কেবল শাক্যমুনি বুদ্ধ এবং ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষোভ্য ব্যবহার করেন। নিম্নে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা প্রদর্শন করা হলো:

২.৩. বরদ মুদ্রা: এই মুদ্রা বরদান, মনস্কামনা পূর্ণ করা, হিতৈষিতা, দান, মহানুভবতা, আন্তরিকতা এবং বরণ করা প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জনা ব্যক্ত করে। (Shearer, 2020: 19) বুদ্ধ মগধের জালিবনে দস্যু অঙ্গুলীমালকে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করে দমন করেন এবং দীক্ষা দানপূর্বক বৌদ্ধসংঘে অন্তর্ভুক্ত করেন। শিল্পীগণ সেই মুদ্রা বৌদ্ধ

মূর্তিতে উপস্থাপন করেন। সাধারণত, বসা অবস্থায় এই মুদ্রায় ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সোজা করে তালু বহির্মুখী ও ভক্তদের দিকে প্রদর্শন করে পায়ের উপর রাখা হয় এবং বাম হাতের আঙ্গুল সোজা করে তালু ঊর্ধ্বমুখী রেখে কোলের উপর কমনীয়ভাবে রাখা হয়। দাঁড়ানো অবস্থায়, এই মুদ্রায় ডান হাত নিচের দিকে ঝুলিয়ে রেখে পাঁচটি আঙ্গুল সোজা করে তালু বহির্মুখীভাবে ভক্তদের দিকে প্রদর্শন করা হয়।

তবে, এ মুদ্রা উপরে-নীচে উভয় হাতে ধারণ করা যায়। কিন্তু হাত ভূমি স্পর্শ করবে না। শাক্যমুনি বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ, অভিসংবোধি মহাবৈরোচন, সর্ববিদ, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর এবং তারাদেবীর মূর্তিতে এই মুদ্রা লক্ষ করা যায়। বিষ্ণুর মূর্তিতেও এই মুদ্রা ব্যবহার করতে দেখা যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নির্মিত মূর্তিতে এই মুদ্রা অধিক ব্যবহার করা হয়। এ মুদ্রাকে ইচ্ছা বা প্রত্যাশা পূরণের মুদ্রাও বলা হয়। এছাড়া, এই মুদ্রাকে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দ্বার খোলার এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহের দরজা বন্ধ রাখার চাবি হিসেবে গণ্য করা হয়। কখনো কখনো হাতে রত্ন পরিহিত দেখা যায়। তখন সেই মুদ্রাকে বলা হয় রত্নসংযুক্ত বরদ মুদ্রা। (হোসেন, ২০০৬: ৩৩; ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪১) বিতর্ক মুদ্রার সঙ্গে এই মুদ্রার ব্যাপক মিল রয়েছে। তাই কখনো কখনো এই মুদ্রাকে বিতর্ক মুদ্রা ভেবে ভুল করা হয়। নিম্নে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করা হলো:

২.৪. ধর্মচক্র মুদ্রা: এই মুদ্রা তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ এবং জ্ঞান বা শিক্ষাদানের ভাবব্যঞ্জনার প্রতিনিধিত্ব করে। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ সারনাথের মৃগদাবে

পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচারকালে এই মুদ্রা ব্যবহার করেন। শিল্পীগণ এই মুদ্রায় সেই ঘটনা প্রতিফলন ঘটান। তাই এই মুদ্রাকে ধর্মচক্র মুদ্রা বলা হয়। (সুনীথানন্দ, ১৯৯৯: ৭৯; হোসেন, ২০০৬: ৩৩; ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪২) সাধারণত এই মুদ্রায় উভয় হাতে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা তর্জনী চেপে গোলাকার রূপ ধারণ-পূর্বক বুকের সামনে রাখা হয়। তবে ডান হাতের তালু বহির্মুখীভাবে ভক্তদের দিকে এবং বাম হাতের তালু অন্তর্মুখীভাবে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত শাক্যমুনি বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ বৈরোচন, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তিতে এই মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। তবে, জাপানে অমিতাভ বুদ্ধের কোনো কোনো মূর্তিতেও এই মুদ্রা লক্ষ করা যায়। এই মুদ্রা দ্বারা ধর্ম দেশনার অর্থ প্রকাশ করা হয় বিধায় একে ব্যাখ্যান মুদ্রাও বলা হয়। নিম্নে ধর্মচক্র মুদ্রা প্রদর্শন করা হলো:

২.৫. সমাধি বা ধ্যান মুদ্রা: এই মুদ্রা পার্থিব বিষয়ে নিরাসক্ত থেকে তত্ত্বজ্ঞানে সমাহিত থাকার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। সিদ্ধার্থ মহাভিনিষ্ক্রমণ বা গৃহত্যাগের পর ছয় বছর কঠোর ধ্যান-সমাধি করেন। শিল্পীগণ এই বিষয়টি সমাধি মুদ্রায় প্রতিফলন ঘটান। (সুনীথানন্দ, ১৯৯৯: ৭৯; হোসেন, ২০০৬: ৩৩; ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪২) ধ্যান-সমাধি চর্চার সময় এই মুদ্রাটি ব্যবহার করা হয়। তাই এই মুদ্রাকে সমাধি বা ধ্যান মুদ্রা বলা হয়। এই মুদ্রায় ডান হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাতের আঙ্গুলের উপর স্থাপন করে কোলের উপর কমনীয়ভাবে রাখা হয়। গৌতম বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ, তথাগত ভৈষজ্যগুরু এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তিতে এই মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। নিম্নে মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হলো:

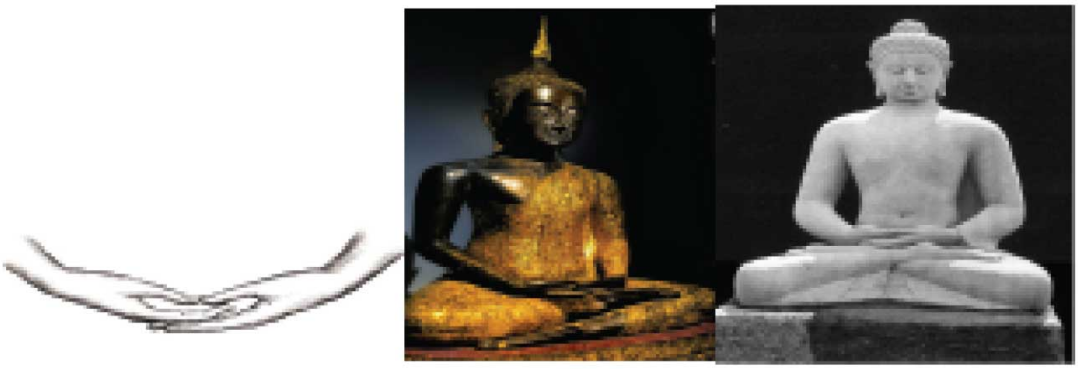

২.৬. ব্যাখ্যান মুদ্রা: এই মুদ্রা তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকাশের বা শিক্ষাদানের ভাবব্যঞ্জনা ব্যক্ত করে। মূলত ধর্মচক্র মুদ্রা এবং ব্যাখ্যান মুদ্রা একই। পার্থক্য শুধু এই যে, ব্যাখ্যান মুদ্রা কেবল এক হাতে প্রদর্শন করা হয়, অপরদিকে ধর্মচক্র মুদ্রা উভয় হাতে ব্যবহার করা হয়। ধর্ম দেশনা বা ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদানের সময় বুদ্ধ এই মুদ্রা ব্যবহার করেন। তাই এই মুদ্রাকে ব্যাখ্যান মুদ্রা বলা হয়। শিল্পীগণ বুদ্ধের জীবনের ধর্ম দেশনার সেই কাহিনি এই মুদ্রায় প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। (হোসেন, ২০০৬: ৩৩) নিম্নে ব্যাখ্যান মুদ্রা প্রদর্শন করা হলো:

২.৭. বজ্রহুংকার মুদ্রা: এই মুদ্রা দৃঢ় অভিব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। বজ্রহুংকার মুদ্রা সাধারণত দুটি হাত বুকের কাছে অন্তর্মুখীভাবে রেখে এক হাতে বজ্র এবং অন্য হাতে ঘন্টা ধারণপূর্বক প্রদর্শন করা হয়। সাধারণত বৌদ্ধ দেবতা ত্রৈলোক্যবিজয়, বজ্রধর এবং সম্বর বজ্রহুংকার মুদ্রা প্রদর্শন করেন। নিম্নে বজ্রহুংকার মুদ্রা প্রদর্শন করা হলো:

২.৮. জ্ঞানমুষ্টি মুদ্রা: এই মুদ্রা তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। এই মুদ্রাকে সর্বজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবেও গণ্য করা হয়। এই মুদ্রায় বাম হাতের বুড়া আঙ্গুল উঁচু করে তা ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বুকের সামনে প্রদর্শন করা হয়। এই মুদ্রাকে বোধ্যঙ্গী মুদ্রাও বলা হয়। (Shearer, 2020: 19; Davids and Charles, 2014: 515) এ মুদ্রাটি কেবল বজ্রধাতু মহাবৈরোচন ব্যবহার করেন, যা নিম্নে দেখানো হলো:

২.৯. করণ মুদ্রা: এই মুদ্রাটি সুরক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। বলা হয়ে থাকে যে, করণ মুদ্রা অপদেবতাদের বিতাড়িত করে এবং নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন, রোগ-ব্যাধি ও অকুশল চিন্তা বাঁধাগ্রস্ত করে। বৃদ্ধাঙ্গুল মধ্যমার উপর রেখে তর্জনী উঁচু করে এই মুদ্রা প্রদর্শন করা হয়। সাধারণত দিকপাল বা ক্রোধরাজ দেবতাগণ এই মুদ্রা ধারণ করেন। নিম্নে মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হলো:

২.১০. তর্জনী মুদ্রা: এই মুদ্রা পাপের শাস্তির ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। এই মুদ্রায় তর্জনী উঁচু করে অন্যান্য আঙ্গুল ভাঁজ করে প্রদর্শিত হয় এবং মুদ্রায় পাশ বা জপমালা বা দড়ি ধারণ করা হয়। দিকপাল বা ক্রোধরাজ দেবতাগণ এই মুদ্রা ব্যবহার করেন। মূলত তর্জনী মুদ্রা দ্বারা পাপীদের ভয় প্রদর্শন করা হয়। নিম্নে মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হলো:

২.১১. বজ্র মুদ্রা: এই মুদ্রা দৃঢ়তার প্রতিনিধিত্ব করে। এই মুদ্রা দ্বারা অগ্নিময় বজ্রপাত নির্দেশ করে, যা বায়ু, জল, অগ্নি, মাটি এবং তেজ এই পঞ্চ উপাদানের প্রতীক। (Beer, Robert, 2003: 228) এই মুদ্রায় বাম হাতের উঁচু করে রাখা তর্জনী ডান হাত দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে, তৎপর বাম হাতের তর্জনীর উপরের প্রান্ত ডান হাতের তর্জনী দ্বারা স্পর্শ করে। নিম্নে মুদ্রাটি দেখানো হলো:

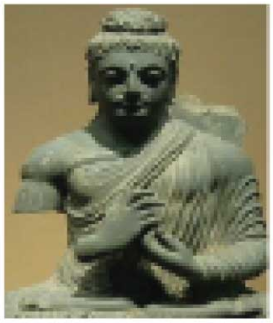

২.১২. বিতর্ক মুদ্রা: এই মুদ্রা যুক্তিখণ্ডনের ভাবব্যঞ্জনার প্রতিনিধিত্ব করে। এই মুদ্রা বুদ্ধের ধর্ম আলোচনা এবং প্রচারের অর্থ জ্ঞাপন করে। এই মুদ্রায় ডান হাত বুকের কাছে রেখে তর্জনী দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুল স্পর্শ করে এবং অন্যান্য আঙ্গুল সোজা রেখে এই মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। এই মুদ্রায় বাম হাতের আঙ্গুল সোজা রেখে তালু কমনীয়ভাবে কোলের উপর স্থাপন করা হয়। অভয় মুদ্রা এবং বরদ মুদ্রার সঙ্গে এই মুদ্রার মিল রয়েছে, তবে এই মুদ্রায় তর্জনী দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুল স্পর্শ করা হয়। বিতর্ক মুদ্রাকে ব্যাখ্যান মুদ্রাও বলা হয়। তারাদেবী এবং বোধিসত্ত্বগণের মূর্তিতে এই মুদ্রা লক্ষ করা যায়। নিম্নে মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হলো:

২.১৩. উত্তরবোধি মুদ্রা: এই মুদ্রা অন্তর্মুখী প্রজ্ঞার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। এই মুদ্রা দ্বারা সম্যক সম্বোধি নির্দেশ করা হয়। উভয় হাতের মাধ্যমে এই মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হয়। উভয় হাত বুকের সামনে রেখে তর্জনী উঁচু করে পরস্পরকে স্পর্শ করে এবং

বাম আঙ্গুলগুলি ভাঁজ করে ডান হাতের আঙ্গুলের ভাঁজের নিচে রেখে এই মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। নিম্নে মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হলো:

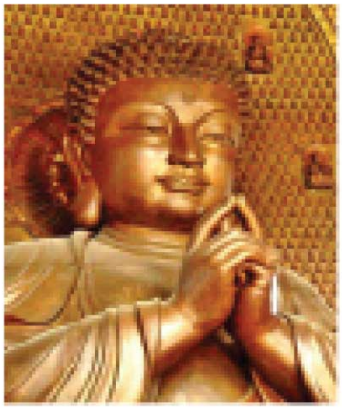

২.১৪. **অঞ্জলি মুদ্রা:** এই মুদ্রা ভক্তি, উৎসর্গ এবং আত্মসমর্পণের প্রতিনিধিত্ব করে। এই মুদ্রাকে নমস্কার মুদ্রা বা হৃদয়াঞ্জলি মুদ্রাও বলা হয়। এই মুদ্রা প্রীতিসম্ভাষণ, প্রার্থনা এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি অর্থ জ্ঞাপক। (Apte, 1965: 25) দুটি হাত ব্যবহার করে এই মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। নমস্কার প্রদানের ন্যায় বুকের সামনে দু'হাতের তালু এবং যুথবদ্ধভাবে উঁচিয়ে রাখা আঙ্গুলগুলি পরস্পর যুক্ত রেখে এই মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হয়। ষড়ক্ষরী এবং অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন তান্ত্রিক দেবরূপে এই মুদ্রাটি লক্ষ করা যায়। নিম্নে এই মুদ্রাটি প্রদর্শন করা হলো:

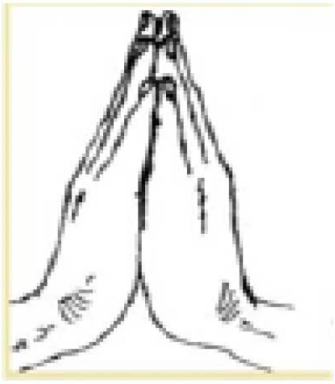

৩. আসন

বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় যোগিগণ ধ্যানের সময় বিভিন্ন আসনে উপবেশনপূর্বক ধ্যান চর্চা করতেন বলে উল্লেখ আছে। যোগশাস্ত্রে অসংখ্য আসনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সমীক্ষায় দেখা যায়, আসনসমূহ বিভিন্ন সময় উদ্ভূত হয়ে যোগশাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আসনসমূহের মধ্যে কিছু আসন প্রাচীনকালে, কিছু আসন মধ্যযুগে এবং কিছু আসন আধুনিককালে উদ্ভূত হয়েছে। দশম-একাদশ শতকে গোরক্ষনাথ রচিত *গোরক্ষশতক*, খ্রিষ্টীয় পনেরশ শতকে রচিত *হঠ যোগ প্রদীপিক* এবং সতেরশ শতকে সিরিনিবাস রচিত *হঠরত্নাবলী* গ্রন্থে ৮৪ প্রকার আসনের কথা উল্লেখ করেছেন। (Mallinson & Singleton, 2017: xxix) পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে আসনকে অবিচলিত এবং আরামদায়ক ভঙ্গি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যযুগে রচিত হটযোগশাস্ত্রে আসনকে শারীরিক এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য কল্যাণকর বলে দাবি করা হয়েছে, যা শারীরিক ও মানসিক যোগসূত্র সৃষ্টি করে। (Pandit, 1991: 205) ভারতীয় মূর্তিশিল্পেও বিভিন্ন আসনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মূর্তিশিল্পে সত্তাদের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা হয়। মূর্তিশিল্পশাস্ত্রে সেসব ভঙ্গিমাকে আসন বলা হয়। মূর্তিশাস্ত্র হিসেবে খ্যাত সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী এবং বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যে বৌদ্ধ মূর্তিসমূহে ব্যবহৃত বিভিন্ন আসনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। আসন মূর্তিশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিছু সত্তার নির্দিষ্ট আসন রয়েছে। ফলে আসন দ্বারাও সেই সত্তাকে বা দেব-দেবীকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। যুগের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আসন উদ্ভূত হয়ে ভারতীয় মূর্তিকলাকে ঋদ্ধ করেছে। নিম্নে বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে ব্যবহৃত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক ব্যবহৃত আসন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৩.১. পদ্মাসন: এই আসনে এক পা আরেক পায়ের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপনপূর্বক উভয় পায়ের তালু ঊর্ধ্বমুখী করে রাখা হয়, যা প্রস্ফুটিত পদ্ম পাপড়ির ন্যায় দেখায়। পদ্মাসনে সাধারণত ডান পা, বাম পায়ের উপর রাখা হয়। তবে, কখনো কখনো বাম পাও ডান পায়ের উপর রাখা হয়। পদ্মাসনকে বজ্রাসন, পর্যাঙ্কাসন, বজ্রপর্যাঙ্কাসন, পর্যাঙ্ক-বন্ধ, স্বস্তিক-পর্যাঙ্ক প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতে দেখা যায়। (Devendra, 1969 : 83-93; Zimmer, 2015: 100, 220; ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪৩) ভারতীয় যোগসাধনায় এই আসনটি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে

আসছে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধ্যান সাধনায় এবং মূর্তিতেও এই আসনটি ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধ বোধিবৃক্ষমূলে এই আসনে উপবেশনপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে পদ্মাসনের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। নিম্নে পদ্মাসনের রেখাচিত্র এবং পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্তি উপস্থাপন করা হলো:

৩.২. অর্ধ-পদ্মাসন: অর্ধ-পদ্মাসন মূলত পদ্মাসনের ন্যায়। তবে, এক পা আরেক পায়ের উপর রাখা। সাধারণত বোধিসত্ত্বগণ এরূপ আসন ব্যবহার করেন। নিম্নে অর্ধ-পদ্মাসনের রেখাচিত্র এবং অর্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্তি উপস্থাপন করা হলো:

৩.৩. ধ্যানাসন বা যোগাসন: ধ্যানাসন মূলত পদ্মাসনের মতোই। তবে পার্থক্য হলো ধ্যানাসনে পায়ের পাতা দুটি লুকানো থাকে ভিতরের দিকে। (ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪৩) পা আড়াআড়িভাবে রেখে একটি পদতল অপর পায়ের জানুর উপর স্থাপিত

থাকে। তবে হাঁটুতে একটু উঁচু ভঙ্গি বজায় রাখা হয়। চোখের দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগে নিবদ্ধ থাকে, যাকে নাসাগ্রদৃষ্টি বলা হয়। নিম্নে ধ্যানাসন বা যোগাসনের রেখাচিত্র ও মূর্তি উপস্থাপন করা হলো:

৩.৪. মহারাজলীলাসন: ডান পায়ের হাঁটু ঈষৎ হেলানো ও ভাঁজ করে উপরের দিকে রেখে পদতল আসনের (seat) উপর রাখা হয়। অতঃপর, ডানহাত শিথিল বা কমনীয় ভঙ্গিতে ডান পায়ের হাঁটুর উপর সোজাভাবে ন্যস্ত রাখা হয়। অপর দিকে, বাম পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে আনুভূমিকভাবে আসনে (seat) শায়িত রাখা হয়। চক্রবর্তীরাজাগণ এরূপ আসন ব্যবহার করে থাকেন। বুদ্ধ এবং সিংহনাদের মূর্তিতে এই আসনের প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নে মহারাজলীলাসনে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির মূর্তি উপস্থাপন করা হলো:

৩.৫. ললিতাসন: এই আসনের পায়ের শৈলী অনেকটা মহারাজলীলা আসনের মতোই, তবে একটি পা আসনের উপর না রেখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। (Bunce, ২০১৬: ১০১৪-১০১৬) এখানে উল্লেখ্য যে, এই আসনে যে-কোনো পা ঝুলিয়ে রাখা

যায়। আবার, যখন দুটি পা চেয়ারে বসার মতো ঝুলে থাকে তখন তাকে বলা হয় ভদ্রাসন। নিম্নে ললিতাসনে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী, জম্ভল এবং দুটি তারা দেবীর মূর্তি উপস্থাপন করা হলো:

৩.৬ আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়: এই আসনটি দেখতে অনেকটা যুদ্ধে গুলি ছোঁড়ার মতো ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। ডান পা এগিয়ে রেখে বাম পা পিছনে মুড়ে বসার ভঙ্গিকে আলীঢ় বলে। অপরদিকে, বাম পা প্রসারিত করে ডান পা পিছনে গুটিয়ে রাখলে সেই উপবেশন প্রক্রিয়াকে প্রত্যালীঢ় বলে। আলীঢ় এর বিপরীত ভঙ্গি হচ্ছে প্রত্যালীঢ়। (ভট্টাচার্য, ২০০৫: ১৪১) যম, কালচক্র হেবজ্র ও মারীচীর মূর্তিতে এই পদভঙ্গি দেখা যায়। নিম্নে এই আসনে যথাক্রমে যম, কালচক্র, হেবজ্র ও মারীচীর মূর্তি উপস্থাপন করা হলো:

৪. পীঠিকা

যার উপর সত্তা উপবেশন করে বা মূর্তি উপবেশন থাকে তাকে পীঠিকা বলে। কিন্তু বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে পীঠিকাকেও আসন বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে 'আসন' শব্দটি দ্বারা উপবেশনের বস্তু (seat) তথা চেয়ার জাতীয় জিনিস নির্দেশ করে। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে বিভিন্ন রকম আসন লক্ষ করা যায়। তন্মধ্যে পদ্মসজ্জিত আসনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। পদ্মসজ্জিত আসনকে পদ্মাসন বলা হয়। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে দু'প্রকার পদ্মাসন লক্ষ করা যায়। এক পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্মাসন এবং দুই পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্মাসন। এছাড়া, সিংহাসন এবং আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট আসনও লক্ষ করা যায়। বুদ্ধত্ব লাভের সময় বুদ্ধ আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট আসনে উপবেশন করেছিলেন, যা 'ব্রজাসন' নামে পরিচিত। সিংহাসনের ক্ষেত্রে সাধারণত পদ্মাসনও যুক্ত থাকে। (Jansen, 1993: 18; Coomaraswamy, 1935: 39) নিম্নে পীঠিকা বা আসনগুলো প্রদর্শন করা হলো:

এক পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্মাসন

দুই পাপড়ি বিশিষ্ট আসন

বুদ্ধগয়ার বজ্রাসন

৫. পাদবেদী ও বাহন

আসনসহ মূর্তি যে পাথরখণ্ডে বা যে বেদীতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় তাকে পাদবেদী বলে। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে তিন ধরনের পাদবেদী লক্ষ করা যায়। যথা- ত্রিরথ, পঞ্চরথ এবং সপ্তরথ বিশিষ্ট পাদবেদী। তন্মধ্যে ত্রিরথ ও পঞ্চরথ বিশিষ্ট পাদবেদী বেশি লক্ষ করা যায়। অনেক মূর্তির পাদবেদীতে অলংকরণ তথা পশু-পাখি, ফুল, লতা-বৃক্ষ এবং বিভিন্ন ঘটনা খোদিত দেখা যায়। হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির ন্যায় বৌদ্ধ সত্তা বা দেব-দেবীর মূর্তির পাদবেদীতেও বিভিন্ন বাহন লক্ষ করা যায়। বাহনের ধারণা পবিত্র

বেদে নিহিত আছে। বাহন হচ্ছে দেব-দেবীর অনুগত প্রাণী, যাতে চড়ে দেব-দেবীগণ যাতায়ত করেন। প্রত্যেক দেব-দেবীর নির্দিষ্ট বাহন আছে। বাহনের মধ্যে অধিকাংশই প্রাণী এবং পৌরাণিক জীব।[৩] যেমন- ইন্দ্রের বাহন হাতি (কখনো ঘোড়া), শিবের বাহন নন্দী, বিষ্ণুর বাহন গরুড় (এটি কখনো কৃষ্ণের বাহন হিসেবে দেখা যায়), দুর্গার বাহন সিংহ (কখনো বাঘ), কার্তিকেয়-এর বাহন ময়ূর, সরস্বতীর বাহন হংস, যমের বাহন মহিষ ইত্যাদি। বাহন সর্বদা দেব-দেবীর সেবা ও উপকার সাধন করে এবং ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অধিকারীও বটে। ধর্মের অনুসারীরা এদেরকেও ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে গণ্য করে পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। উচ্চশ্রেণির দেব-দেবীগণ এক জগৎ থেকে অন্য জগতে এবং তাঁর অনুসারী ও অন্যান্য সত্তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করার নিমিত্তে বাহনের মাধ্যমে উপস্থিত হন। এছাড়া যুদ্ধেও বাহন ব্যবহৃত হয়। এরা যুদ্ধে প্রভুদের সাহায্য করে এবং ভয়ংকর রূপ ধারণপূর্বক প্রভুর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাতৃদেবী দুর্গাকে হিমালয় বাহন হিসেবে সিংহ দান করেন। তিনি সিংহের সাহায্যে মহিষাসুরকে ধ্বংস করেন। এ কারণে বাহনকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতীক হিসেবেও গণ্য করা হয়। অধিকন্তু বাহন দেব-দেবীর মর্যদার প্রতীকও বটে, যা দেবমণ্ডলে তাঁদের শক্তি, কার্যক্ষমতা এবং মর্যদা নির্দেশ করে। যেমনঃ ইন্দ্রের বাহন হচ্ছে হস্তী, যা রাজমর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এর দ্বারা ইন্দ্র যে দেবতাদের রাজা তা নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে, বাহন সিংহ বা বাঘ মাতৃদেবী দুর্গার ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক শক্তি নির্দেশ করে। বাহনের গতি দেব-দেবীর সংবেদনশীলতাও প্রকাশ করে। অর্থাৎ, তাঁরা কত দ্রুত প্রার্থনাকারীর আবেদনে সাড়া দিতে পারে তাও জ্ঞাপন করে। বাহনের মাধ্যমে দেব-দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও নির্দেশিত হয়। যেমন- হংসকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশুদ্ধতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়াশীলতা, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার এবং পাখিকে সৌন্দর্য, শান্তি ও কমনীয়তার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে সাধারণত তান্ত্রিক দেব-দেবী এবং হিন্দুধর্ম হতে গৃহীত দেব-দেবীর মূর্তিতে বাহন লক্ষ করা যায়। যেমন- যমান্তকের বাহন মহিষ, মারীচীর শূকর, জাঙ্গুলীর সর্প, গণপতির ইঁদুর, বিষ্ণুর গরুড়, কার্তিকেয়-এর ময়ূর ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কোনো বাহন নেই। তবে মূর্তিশিল্পে তাঁদেরকে বিভিন্ন প্রাণী খোদিত আসনে উপবেশন বা দণ্ডায়মান দেখা যায়। যেমন- গৌতম বুদ্ধ ও তথাগত বা ধ্যানী বুদ্ধ মহাবৈরোচনকে সিংহ, তথাগত অক্ষোভ্যকে হাতি,

তথাগত রত্নসম্ভবকে ঘোড়া, তথাগত অমিতাভকে ময়ূর, তথাগত অমোঘসিদ্ধিকে গরুড় এবং বোধিসত্ত্ব সিংহনাদকে সিংহখোদিত আসনে উপবেশন বা দণ্ডায়মান দেখা যায়। তবে বৌদ্ধ শিল্পশাস্ত্রে এসব বাহন বা প্রাণী বিশেষ ভাবব্যঞ্জনা নির্দেশ করে। যেমন- বৃষভ প্রাণশক্তি, সিংহ আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্ব এবং হাতি ধর্মের বিকশিত রূপ প্রভৃতি নির্দেশ করে। (Coomaraswamy,1935: 12; Yoritomi, 1994: 5-7) মূর্তিশিল্পে সাধারণত সত্তাগণ বাহনের উপর উপবেশন বা দণ্ডায়মান থাকে। তবে কখনো কখনো সত্তার পাশে বাহনকে স্থাপন করতে দেখা যায়। নিম্নে পাদবেদী ও বাহন প্রদর্শন করা হলো:

ত্রিরথ পাদবেদী

পঞ্চরথ পাদবেদী

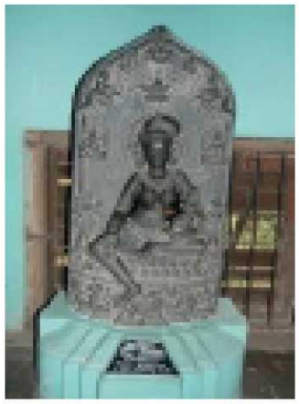

সপ্তরথ পাদবেদী

ব্যাঘ্র বাহনযুক্ত মহাকাল

ঘোড়া বাহনযুক্ত ইন্দ্র

৬. শারীরিক ঠাম

মূর্তিশিল্পে বিভিন্ন রকম দৈহিক ভঙ্গি লক্ষ করা যায়, যা শিল্পশাস্ত্রে 'শারীরিক ঠাম' নামে অভিহিত। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে ১০৮টি ঠামের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে

বিভিন্ন রকম শারীরিক ঠাম লক্ষ করা যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, একিমবো এবং সমভঙ্গ। (হোসেন, ২০০৬: ২৮) আভঙ্গ হচ্ছে পায়ের দুই গোড়ালি, নাভি ও নাক একই উল্লম্ব সরলরেখায় অবস্থান করে। দ্বিভঙ্গের ক্ষেত্রে কোমড় পর্যন্ত সোজা রেখে নাভি থেকে উপরের অংশ যে-কোনো একদিকে সামান্য সরে থাকে। ত্রিভঙ্গ হচ্ছে নাভি থেকে দেহের উপরের আধা অংশে তিন-মাত্রায় তীর্যকভাব বজায় থাকবে। অতিভঙ্গ হচ্ছে মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত দেহের কোনো দুটি অংশই একই সরলরেখায় অবস্থান করে না, যা উন্মাদনা ও ক্রোধ প্রকাশ করে। আলীঢ় হচ্ছে ডান পায়ের হাঁটু বাইরের দিকে প্রসারিত এবং পাতা ভেতরের দিকে সরে থাকে, আর বাঁ পা দৃঢ়ভাবে পেছনের দিকে সংবদ্ধ থাকে, ঠিক যেন যুদ্ধে গুলি নিক্ষেপের মতো। প্রত্যালীঢ় হচ্ছে আলীঢ় এর বিপরীত ভঙ্গি। একিমবো হচ্ছে হাত কোমড়ে রেখে দাঁড়ানো। সমভঙ্গ হলো নাভি সরলরেখায় রেখে দেহের উপর ও নীচের অংশ পরস্পর বিপরীত বাঁক নেবে। কিছু কিছু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিতে সত্তাকে বহু মাথা, হাত এবং প্রত্যঙ্গ যুক্ত দেখা যায়। মূলত এগুলো প্রতীকী। এর দ্বারা সর্বত্র বিদ্যমানতা, সর্বেশ্বরবাদ এবং বহুমুখী গুণসম্পন্ন বোঝায়। অর্থাৎ, একই সময়ে বহুস্থানে বা সর্বত্র বিরাজ করার এবং বহু কর্ম সম্পাদনের অর্থ প্রকাশ করে। (Srinivasan, 2001: 279-280) ভারতীয় নৃত্যেও বহু নৃত্যশিল্পী একে অপরের পশ্চাতে বিভিন্নভাবে দাঁড়িয়ে বহুহস্তের ধারণা প্রকাশ করতে দেখা যায়। নিম্নে শারীরিক ঠামসমূহের রেখাচিত্র প্রদর্শন করা হলো:

আভঙ্গ | দ্বিভঙ্গ | ত্রিভঙ্গ | অতিভঙ্গ

৭. জ্যোতিচক্র

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে মহাপুরুষের লক্ষণ হিসেবে জ্যোতিচক্রের কথা উল্লেখ আছে। জ্যোতিচক্রকে শিরচক্র এবং প্রভামণ্ডলও বলা হয়। (Rao, 1914: 27) 'জ্যোতিচক্র' যোগী এবং রাজা উভয়েরই লক্ষণ। কারণ উভয় ব্যক্তিকে মহাপুরুষ এবং অতিমানবীয় সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে, এখানে যোগী বলতে সাধারণ যোগী নয়, বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন এরূপ সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইরানের শিল্পকলায় রাজার মূর্তির মাথার পশ্চাতে জ্যোতিচক্র যুক্ত থাকে, যা দ্বারা রাজার গরিমা এবং বিত্ত-বৈভব প্রকাশ করা হয়। থেরবাদী এবং মহাযানী উভয় সাহিত্যে বুদ্ধকে উজ্জ্বল বা আলোকিত সত্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বুদ্ধ একদিকে মহাপুরুষ, অপরদিকে যোগী। এছাড়া, বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের সময় রহস্যময় বা মিস্টিরিয়াস উজ্জ্বল আলো উপলব্ধি করেন। এসব বিষয় বুদ্ধ মূর্তির মাথার পশ্চাতে যুক্ত জ্যোতিচক্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে জ্যোতিচক্র আলোকিত সত্তার অর্থ নির্দেশ করে। (Yoritomi, 1994: 15) এ কারণে ভারতীয় মূর্তিকলায় জ্যোতিচক্র ব্যবহার করা হয়। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম জ্যোতিচক্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন- কুষাণ যুগে নির্মিত গান্ধার শিল্পকলার মূর্তিতে গোলাকার, ছোট এবং কারুকাজ বিহীন জ্যোতিচক্র ব্যবহার করা হতো। অপরদিকে, একই সময়ে নির্মিত মথুরা শিল্পকলার মূর্তির জ্যোতিচক্র আকারে বড় এবং কোমড় অবধি বিস্তৃত। গুপ্তযুগের জ্যোতিচক্র আকারে বড় এবং বিভিন্ন কারুকাজ সমৃদ্ধ। গুপ্তোত্তর হতে পালযুগের সূচনার মধ্যবর্তী সময়ের জ্যোতিচক্র আলোকছটা বিচ্ছুরিত বা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত এবং প্রান্তসীমা অলংকৃত। উক্ত সময়ের কিছু কিছু জ্যোতিচক্রের প্রান্তরেখায় নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর অগ্নি শিখার চিহ্ন রয়েছে। পালযুগে নির্মিত অধিকাংশ মূর্তির জ্যোতিচক্র ডিম্বাকৃতি। (Alam, 1985: 136) ফলে জ্যোতিচক্রের আকৃতি ও কারুকাজ মূর্তির সময়কাল নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বিভিন্ন যুগের জ্যোতিচক্র উপস্থাপন করা হলো। তন্মধ্যে ক-নং হচ্ছে কুষাণ যুগে নির্মিত গান্ধার শিল্পকলার জ্যোতিচক্র; খ-নং হচ্ছে কুষাণ যুগে নির্মিত মথুরা শিল্পকলার জ্যোতিচক্র; গ-নং হচ্ছে গুপ্তযুগে নির্মিত গুপ্তশিল্পকলার জ্যোতিচক্র; ঘ-নং হচ্ছে গুপ্তোত্তর হতে পালপূর্ববর্তী সময়কার জ্যোতিচক্র এবং ঙ-নং হচ্ছে পালযুগের জ্যোতিচক্র।

ক-নং

খ-নং

গ-নং

ঘ-নং

ঙ-নং

৮. আয়ুধ

'আয়ুধ' শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে অস্ত্র। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে বিভিন্ন সত্তার মূর্তিতে ধারণকৃত বা সংযুক্ত বস্তুসমূহকে 'আয়ুধ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সত্তাদের মূর্তি সনাক্তের ক্ষেত্রে আয়ুধ ক্ষেত্র বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র, পুরাণ, সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় পুস্তকে বিভিন্ন রকম আয়ুধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় মূর্তিকলায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য আয়ুধ বা উপকরণসমূহ হলো: বজ্র, কর্ম, ত্রিশূল, অঙ্কুশ, খট্বাঙ্গ, খেটক, চক্র, শঙ্খ, ধনু, ঠঙ্কা, পাশ, গদা, বাণ, অগ্নি, খড়্গ, কর্ত্রী, পরশু, শূল, কীল বা বজ্রকীল, দণ্ড,শক্তি, মুসল, হল, বীণা, ডমরু, বেণু বা বাঁশি, ঘন্টা (বজ্রঘন্টা), কমণ্ডলু, শ্রুক (এক ধরনের চামচ), দর্পণ, কপাল, ব্রহ্মসূত্র পুস্তক, অক্ষমালা বা জপমালা, পুণ্ডরিক বা পদ্ম, নাগপুষ্প, কুণ্ডাপুষ্প, ধ্বজা বা কেতু, চামর, মণি, নাগ, নকুল ইত্যাদি। 'আয়ুধ' এক ধরনের প্রতীকও বটে, যা সংশ্লিষ্ট সত্তার স্বভাব, বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্রম নির্দেশ করে। প্রত্যেকটি আয়ুধ একটি নির্দিষ্ট অর্থ, তাৎপর্য বা ধারণা প্রকাশ করে। যেমন- 'আয়না' মনের স্বচ্ছতা এবং সচেতনতা, 'ধ্বজা' বিজয় এবং

'রাজদণ্ড' কর্তৃত্ব ও আইনের শাসন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। (Rao, 1914: 2-13) নিম্নে আয়ুধের চিত্র প্রদর্শিত হলো:

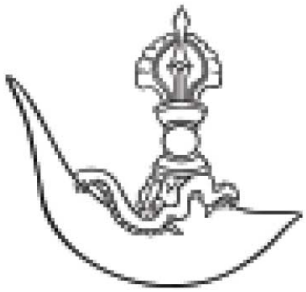		
কর্ত্রী	কর্ন	ডমরু যুক্ত ত্রিশূল
	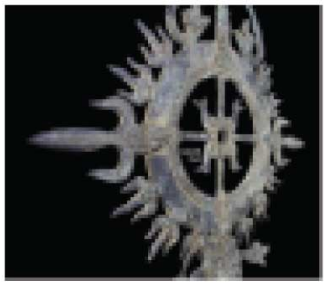	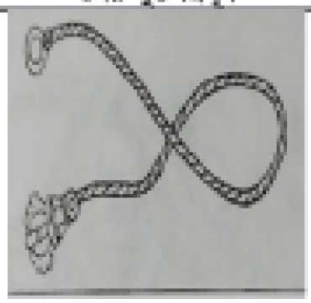
খট্টাঙ্গ	চক্র	পাশ

৯.অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ

ভারতীয় মূর্তিশিল্পে নানা রকম অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখা যায়। (Coomaraswamy, 1935: 22) নিম্নে বৌদ্ধ মূর্তিকলায় ব্যবহৃত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলো:

৯.১. কর্ণকুণ্ডল: কানে পরিহিত অলংকারকে কর্ণকুণ্ডল বলে। কয়েক ধরনের কর্ণকুণ্ডল দেখা যায়। যেমন- মকরকুণ্ডল– যা মকড় আকৃতির; পত্রকুণ্ডল– যা দেখতে পাতার আকৃতি বিশিষ্ট এবং মাকড়ি– যা বলয় শ্রেণিভুক্ত। তবে এটি খুবই কম পরিধান করতে দেখা যায়। নিম্নে তা চিত্রে তুলে ধরা হলো:

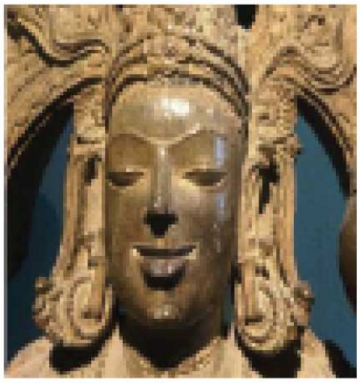

৯.২. কণ্ঠালংকার বা কণ্ঠাহার: মূর্তিতে বিভিন্ন রত্ন ও বস্তুর সমন্বয়ে তৈরী মালা গলায় ধারণ করতে দেখা যায়। মূর্তিশাস্ত্রে কয়েক ধরনের কণ্ঠালংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- ১) ছন্নবির: এটি ক্রসাকৃতির রত্নখচিত অংশুল, যা দেখতে রজ্জুতে বাঁধা মাদুলির ন্যায় এবং বুকের উপরে ঝুলে থাকে। সাধারণত এটি যোদ্ধাদের গলায় দেখা যায়। ২) হার: এক বা একাধিক প্রস্তের অংশুল রজ্জু। এক প্রস্ত বিশিষ্ট এ-শ্রেণির হারকে একাবলী বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের পুঁথি দিয়ে একাবলী তৈরি করা হয়। এটি গলার সাথে একবারে সংলগ্ন থাকে। ৩) কণ্ঠি: এটি গলার কাছ থেকে ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে স্তনের উপর অংশ পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তবে মাঝের অংশটুকু অধিক চওড়া ও কৌণিক হয়ে থাকে। কণ্ঠিতে প্রচুর কারুকাজ দেখা যায়। ৪) ফলকহার: এটি প্রস্তর মুক্তা গাঁথা হার। তবে মাঝখানে একটি বড় মাদুলি ঝুলে থাকে। ৫) উপগ্রীভ: গলা ও বুকের মাঝামাঝি নেকলেস আকারে বিছিয়ে থাকে। ৬) স্তনহার: এক বা একাধিক প্রস্তের হার যা দু'স্তনের মধ্য দিয়ে পেটের উপর অংশ পর্যন্ত ঝুলে থাকে। ৭) হরিণমালা: এটি পেটের উপর পর্যন্ত ঝুলে থাকে। (হোসেন, ২০০৬: ৩৬) নিম্নে অলংকারটির চিত্র তুলে ধরা হলো: